Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 124–130
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

সীতা ও দ্রৌপদী : মল্লিকা সেনগুপ্তের সাহিত্যে প্রাচীন মহাকাব্যের দুই নারী

শর্মী বন্দ্যোপাধ্যায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেল : sharmibandyopadhyay10@gmail.com

Keyword
নারী ভাবনা, রামায়ণ, মহাভারত, সীতা, দ্রৌপদী, আধুনিক নারী, নিরস্ত্রীকরণ, অনার্য।

Abstract
উনিশ শতক থেকে বঙ্গে নারী জাগরণের সূচনা হয়। এই শতকের প্রথমার্ধ থেকে নারী বিষয়ক নানান আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। এই আন্দোলনের প্রভাবে নারী তাঁর আত্মশক্তি খুঁজে পেতে থাকে। বাংলা সাহিত্য জগতেও নারী প্রবেশাধিকার পায়। সে নিজের কলমে নিজের কাহিনি লিখতে শুরু করে। বিশ শতকে এসে নারীর এই লেখনী হয়ে ওঠে আরও তীক্ষ্ণ ও পরিণত। এই বিশ শতকের আটের দশকের একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক মল্লিকা সেনগুপ্ত।মানবী চেতনায় ঋদ্ধ এই সাহিত্যিকের কলমে প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কালের বঞ্চিত অত্যাচারিত নারীর জীবন যন্ত্রণার চিত্র ফুটে উঠেছে। মল্লিকার মতে ভারতের প্রাচীন দুই মহাকাব্যের দুই নারী সীতা ও দ্রৌপদী সেই যুগে সবচেয়ে বেশি অবহেলিতা। তাই তাঁর রচনায় এই দুই নারীর কথা এসেছে বারবার। রামায়ণের প্রধান নারী চরিত্র, রামের মহিষী সীতাকে নিয়ে তিনি লেখেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'সীতায়ন'। এই উপন্যাস জনকনন্দিনী সীতার জীবন পরিক্রমার এক আধুনিক গদ্যগাথা।বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণের উত্তরকাণ্ড একটি বিশেষ অংশ অবলম্বনে এই উপন্যাস লেখা হয়েছে। প্রজানুরঞ্জন করতে গিয়ে নিজের স্ত্রীর প্রতি রাজা রাম যে অন্যায় করেছিলেন মার্জিত ভাষায় মল্লিকার সীতা তার প্রতিবাদ করেছেন এই রচনার মাধ্যমে। সীতাকে নিয়ে মল্লিকা রচনা করেছেন বেশ কয়েকটি কবিতা। 'ধনতেরস', 'রাষ্ট্রপতিকে লেখা এক মেয়ের চিঠি' 'রামরাজ্য' কবিতায় সীতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা অযোধ্যার রাজবধূ কোমলস্বভাবা সীতা নয় তেজোদীপ্ত এক নারী যে স্বামীর অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন সহজভাবে। সীতার মত মহাভারতের অন্যতম নারী দ্রৌপদীর যন্ত্রণা মল্লিকাকে নাড়া দেয় ভীষণভাবে। 'কথামানবী' কাব্যের 'দ্রৌপদীজন্ম' কবিতাটি দ্রৌপদীকে নিয়ে লেখা তাঁর অসাধারন একটি কবিতা। পঞ্চ স্বামীর পত্নী হয়েও দ্রৌপদীর জীবনে জোটে অশেষ দুঃখ। সভায় গুরুজনদের সামনে নিগৃহীতা দ্রৌপদী স্বামীদের দিকে প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে প্রতিবাদ করেন নারী নির্যাতনের। 'দ্রৌপদীর গান', 'দ্রৌপদী' কবিতাগুলিতেও দ্রৌপদীর প্রতিবাদী রূপটির সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। এইভাবে তাঁর রচনার মাধ্যমে সীতা ও দ্রৌপদীর জীবনের করুন কাহিনিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরে আধুনিক সময়ের প্রেক্ষিতে আধুনিক নারীর প্রতিনিধি করে তাদেরকে গড়ে তুলেছেন, যা বাংলার নারী বিষয়ক

সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

Discussion

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম একজন বিখ্যাত কবি হলেন মল্লিকা সেনগুপ্ত। বিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যরচনা শুরু করে বাংলা সাহিত্যকে তিনি দিয়েছেন চোদ্দটি কাব্যগ্রন্থ, তিনটি উপন্যাস ও তিনটি প্রবন্ধগ্রন্থ.তাঁর সাহিত্যের মূল সুর ছিল নারীভাবনা। সমাজে নারীর অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করেছেন প্রাচীনকাল থেকেই সমাজে নারী পুরুষের হাতে অত্যাচারিতা, অবহেলিতা। নারী নিগ্রহ শুধুমাত্র বর্তমান সমাজের ঘটনা নয়। প্রাচীন সমাজও এইসব ঘটনার সাক্ষ্য বহন করছে তা তিনি তাঁর রচনায় তুলে ধরেছেন। প্রাচীন মহাকাব্য 'রামায়ণ' ও 'মহাভারতে'ও এর যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' সর্বজন সমাদৃত। কিন্তু এই দুটি মহাকাব্যে নারীর প্রতি সুবিচার করা হয়নি। এই দুই মহাকাব্যের নায়িকারা রাজরানী হয়েও সহ্য করেছেন চরম দুর্ভোগ। তাই এই দুই নারী সীতা ও দ্রৌপদীর হয়ে হয়ে কলম ধরেছেন লেখিকা। মল্লিকা তাঁর 'কথামানবী' কাব্যের একটি অংশে লিখেছেন –

> "ইতিহাসের ছাই এবং ভস্মের মধ্যে নারী নামক যে আগুন চাপা পড়ে আছে আমি তারই ভাষ্যকার।"[১]

তাই তাঁর রচনায় বারবার উঠে এসেছে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নারীর কথা। প্রাচীন যুগে রচিত মহাকাব্য রামায়ণের অন্যতম চরিত্র সীতা ও দ্রৌপদী সেই নারীদেরই প্রতিনিধি। সীতাকে নিয়ে তিনি রচনা করেছেন তাঁর অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস 'সীতায়ন' এবং তাঁর কাব্যগ্রন্থের বেশ কিছু কবিতা। এই কবিতাগুলি হল ধনতেরস, রাষ্ট্রপতিকে লেখা একটি মেয়ের চিঠি, রামরাজ্য, অস্ত্রপুরুষ, অশোকবনের সীতা সরখেল প্রভৃতি। আবার মহাভারতের অন্যতম তেজোদৃপ্ত নারী দ্রৌপদী তাঁর বহু কবিতার মুখ্য চরিত্র হয়ে উঠেছে। দ্রৌপদীকে নিয়ে তিনি রচনা করেছেন তাঁর কথামানবী কাব্যের বিখ্যাত কবিতা দ্রৌপদীজন্ম। এছাড়া 'দ্রৌপদীর স্বামীরা', 'দ্রৌপদীর গান', 'দ্রৌপদী', 'দ্রৌপদীজন্ম' প্রভৃতি কবিতার মাধ্যমে দ্রৌপদীর জীবনের নানান ঘটনা তুলে ধরেছেন লেখিকা।

প্রথমেই সীতায়ন উপন্যাসটির কথা আলোচনা করা যেতে পারে। জনক নন্দিনী সীতার বিবাহ হয়েছিল রঘুকুলপতি শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে। কিন্তু রাজমহিষী হয়েও তাঁর বৈবাহিক জীবনের শুরু থেকে অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত অভাবিত দুর্ভাগ্যের রাত্রি তার ছায়াসঙ্গিনী হয়ে ছিল। যে রামরাজ্য প্রত্যেক মানুষের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সেই রাজ্যের রানীরই সেখানে স্থান হল না। সীতার জীবনের এই দুঃখ যন্ত্রণার কাহিনি নিয়ে নিয়ে মানবতাবাদী লেখিকা মল্লিকার সেনগুপ্ত তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'সীতায়ন' রচনা করলেন। এই নামক উপন্যাসটি জনক দুহিতা সীতার জীবন পরিক্রমার এক আধুনিক গদ্যগাথা। সীতায়নের উৎসর্গ পত্রে লেখা আছে– এই সময়ের সীতাদের অর্থাৎ মল্লিকা এই যুগের অবহেলিতা অত্যাচারিতা নারীদের এবং সীতাকে সমগোত্রীয় করে দেখেছেন।

মল্লিকা বাল্মীকি রচিত রামায়ণের একটি বিশেষ অংশ বেছে নিয়ে উপন্যাসটি শুরু করেছেন লেখিকা। রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বনে এই উপন্যাস রচিত হয়েছে। বনবাস থেকে থেকে ফিরে আসা সীতা যখন সন্তানসম্ভবা, পবিত্র মাতৃত্বের বিভায় আলোকিত ঠিক এইরকম এক সুন্দর মুহূর্তে লোকপবাদের ভয়ে প্রজানুরঞ্জনের কথা ভেবে রাম সীতাকে নৈমিষারন্যে বাল্মীকির আশ্রমের কাছে একটি স্থানে নির্বাসনে পাঠালেন। গর্ভিণী স্ত্রী ও গর্ভস্থ সন্তানকে উপেক্ষা করে রাম রাষ্ট্রতত্ত্বকে উচ্চে স্থান দিয়ে স্ত্রীর প্রতি যে অমানবিক আচরণ করলেন তার বিরুদ্ধে লেখিকা এই উপন্যাস রচনা করেছেন। মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁর উপন্যাসটিকে মোট তেরোটি পরিচ্ছেদে ভাগ করেছেন। এই তেরোটি পরিচ্ছেদের নামকরণের মাধ্যমে বোঝা যায় পরবর্তী পর্বে কী ঘটতে চলেছে। উপন্যাসের শুরু হয়েছে রামের আদেশে লক্ষ্মণ কর্তৃক সীতা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে এবং সীতার পাতাল প্রবেশ দিয়ে উপন্যাসটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

এই উপন্যাসের সীতা স্বামীর প্রতি ভালবাসা থাকলেও পতিভক্তির আদর্শে অবিচল নন। সীতা এখানে অবলা নন ,সত্য প্রত্যয়ে দীপ্ত এক নারী। তাই লক্ষণের কাছ থেকে নির্বাসনদণ্ডের সংবাদে ক্রুরতম বিবাহ বিচ্ছেদের অন্যায় ও অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের সম্মুখীন হয়ে তিনি নিজের অস্তিত্বের সঙ্কটের জায়গা থেকে প্রিয় দেবর লক্ষ্মণকে প্রশ্ন করে–

> "তোমাদের প্রিয় প্রজাগণ তো একদিন একথাও বলতে পারে যে অরণ্যে যে সন্তান সীতা প্রসব করেছেন, তা রামচন্দ্রের ঔরসজাত নয়।"[২]

আবার লক্ষ্মণ সীতা নির্বাসনের কারণ হিসাবে যখন বারবার অনার্য রাক্ষস দের দায়ী করে থাকেন তখন সীতা তাঁর তীব্র প্রতিবাদ করেন। লক্ষ্মণ রামের কথা বলতে গিয়ে বলেন,

> "দেবী, তিনি আপনাকে সন্দেহ করেন না কিন্তু তিনি বড় বেশি প্রজানুরঞ্জক, তিনি বিশেষভাবে আমাকে বলেছেন অনার্য উপজাতি অধ্যুষিত অরণ্যে আপানাকে যেন ত্যাগ না করি।"[৩]

তখন অনার্য নয় তার পরম আত্মীয় আর্যরাই যে তাঁর বিপদের জন্য দায়ী সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সীতা। সীতা বলেছেন হাঃ লক্ষ্মণ বনবাস আমার পক্ষে নতুন নয়। আমি তপোবনের সব মাহাত্ম্য জানি বলেই তা দর্শনে অভিলাষী ছিলাম। পরন্তু অনার্যদের বিপজ্জনক বলে মনে করিনা। 'বিপজ্জনক তোমাদের আর্য সভ্যতার আত্মগর্বী রীতিনীতি'।[৪] সীতার মতে রাম যদি বনবাস কালে বারবার অনার্যদের পীড়ন না করতেন তাহলে সীতার এই অবস্থা হত না। সীতা মনে করেন তাঁর সর্বনাশের পূর্বপ্রস্তুতির প্রতিটি বীজ রামচন্দ্রের নিজ হাতে নির্মিত।

শুধু তাই নয়, ব্যাঙ্গক্তির সুরে সীতা রামচন্দ্রের এরূপ আচরণের সমালোচনা করেন। কিন্তু সীতা একজন রক্ত মাংসের মানুষ। তাই পরমুহূর্তে সীতা তার ভবিষ্যত সন্তানের ভরণপোষণের কথা ভেবে ভেঙে পড়েন। লক্ষ্মণকে তিনি বলেন—

> "যখন তার দন্ত উদগম হবে, যখন মাতৃ দুগ্ধ তার পক্ষে যথেষ্ট হবে না তখন সে কি তোমাদের ঘৃণ্য বনবাসী অনার্য দের মত ফলমূল ও বন্য শূকরের মাংস গ্রহণ করবে, না আমিষ বর্জিত ব্রাহ্মণের আহার্য ভিক্ষা করে তাকে বাঁচিয়ে রাখব!"[৪]

সীতা তার এই শ্লেষবাক্যগুলির মধ্যে দিয়ে তাঁর প্রতিবাদীসত্ত্বার পরিচয় ফুটে উঠেছে তেমন একজন স্বামী পরিত্যক্তা অসহায় নারীর জীবন যুদ্ধের প্রতিচ্ছবিও ধরা পড়েছে।

সীতায়ন উপন্যাসের সীতার চরিত্রের আরেকটি দিক হল অনার্যদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি। একে একে অনার্য জাতির উপর আর্য জাতির ক্ষমতা বিস্তারের কথা, তাদের অরণ্যের অধিকারের কথা উঠে আসে সীতার কথায়। বাল্মীকির কাছে পূর্বসুখের স্মৃতি স্মরণকালে সীতা বলে ওঠেন বনবাসকালে রাঘবের চরিত্রের হিংস্রবৃত্তি প্রকাশিত হয়, যার জন্য তাদের জীবন ছারখার হয়ে যায়। বাল্মীকির মতে এটা ক্ষত্রিয়দের স্বাভাবিক বৃত্তি হলেও সীতার মতে সে হিংস্রতা অনিবার্য ছিল না। অনার্য মানুষগুলি যুগ যুগ ধরে অরন্যভুমির বাসিন্দা ছিল। ওই অরণ্যের ইঙ্গুদি, আমলকি, বিল্ব খেয়ে তাদের পিতৃপুরুষেরা বেঁচে থেকেছে। তারাও ঐ ফলের অধিকারী। 'কিন্তু আর্য ক্ষত্রিয়েরা যখন ব্রাহ্মণের ত্রাণে উন্নত আয়ুধ নিয়ে বনভূমি, আদিম বাসিন্দাদের উপর অত্যাচার করেছে তখন, তখন নিষাদের শরে আহত ক্রৌঞ্চের মত অসহায় রাক্ষসেরা দলে দলে নিহত হয়েছে। যার পরিণতি হিসাবে রাবণ সীতাকে হরণ করেছে এবং সীতা নির্বাসিত হয়েছে। পরক্ষনেই শূর্পনখার প্রসঙ্গ এলে তার অঙ্গচ্ছেদের ভয়াবহ দৃশ্য স্মরণ করে নিজ হরণের জন্য এই ঘটনাকে দায়ী করেন। বাল্মীকিকে তিনি বলেন–

> "পিতা আপনি বলুন ক্ষত্রিয় পুরুষের হিংস্রতার বলি এই দুটি অনার্য নারীর কি সুবিচার প্রাপ্য নয়?"[৫]

আমরা এখানে দেখতে পাই সীতার ভাবনায় অনার্য আর আর্য নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এরা কেউ একে অপরের প্রতিপক্ষ নয় তা সীতা বলতে চেয়েছেন। এখানে প্রতিপক্ষ হল দুর্বল ও সবল মানুষ। প্রতিপক্ষ হল নারী ও পুরুষ। বাল্মীকি বলেন, প্রজার রক্ষা রাজধর্ম। তাই নিরস্ত্রিকরণের ধর্ম ক্ষত্রিয়দের জন্য নয় কিন্তু সীতা বলেন যে বনভূমি ইক্ষাকু বংশের আয়ত্তাধীন সেখানে বসবাসকারী অনার্যরাও তো রাজার প্রজা। তাই সীতার মতে অনার্য ও আর্য নারী উভয়কেই রক্ষা করা রামচন্দ্রের কর্তব্য।

উপন্যাসটির চতুর্থ পরিচ্ছেদ থেকে দেখা যায় অনার্য সমাজের চিত্র। তাদের জীবনযাত্রা এবং আর্য আক্রমণের হাত থেকে নিজেদের রক্ষার প্রস্তুতি। একে একে লবন, রোমশ শল্যরা আর্যদের হাতে প্রাণ দেয়। শম্বুক তাদের ত্রাসতাড়িত জীবন ছেড়ে শৃঙ্খলিত জীবনে অভ্যস্ত হতে থাকে। স্তব করতে থাকে। পুজা করতে থাকে আর্যদের মত গাভীকে। ব্রাহ্মণ ধর্মের নিষেধ অগ্রাহ্য করে রুদ্র মূর্তি গড়ে তার সামনে বসে মন্ত্র উচ্চারণ করে। ব্রাহ্মণ সংস্কৃতি শূদ্রদের ধর্মাচরণ মেনে

নেয় না। শম্বুক হত্যা হয়। এই শূদ্রদের হয়ে সীতা অগস্ত্যকে প্রশ্ন করেন 'হে মহাভাগ শূদ্রও তো মানুষ তবে কেন তার ধর্মাচরণে স্বাধীনতা থাকবে না। অগস্ত্য বিরক্ত হয়ে জানিয়ে দেন ধর্ম সকলের জন্য নয়, নারী যেমন পূজার অধিকার পায় না, শূদ্রও পায় না। ধর্মাচরণ ব্রাহ্মণ পুরুষের কৃত্য। সীতা প্রতিবাদ করে অগস্ত্যকে প্রশ্ন করেন, 'কেনই বা নারী ও শূদ্রকে স্বেচ্ছায় ধর্মাচারণ করতে দেবেন না আপনারা? এই আমি যদি এখন ঈশ্বরসাধনায় নিজেকে সমর্পণ করতে চাই। আপনি কি আমার স্বামীকে এনে দিতে পারবেন? পারবেন না আপনারা, তথাপি স্বামীর ধর্মসহচরীমাত্র করে রাখবেন নারীকে লেখিকা মল্লিকা এখানে সীতার মাধ্যমে ব্রাহ্মন্য সংস্কৃতির খারাপ দিকগুলির কথা তুলে ধরেছেন।

সীতার কথায় অগস্ত্য ক্রুদ্ধ হলে সীতা তাঁকে প্রণাম করে রাগ প্রশমিত করেন। এদিকে রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন হয়। স্বর্ণসীতাকে পাশে নিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রস্তুতি হয়। এদিকে সভায় লব কুশ বাল্মীকির রচিত রামগান শোনালে সভার সবাই রামচন্দ্রের সঙ্গে চেহারার মিল দেখে রামের পুত্র বলে চিনতে পারেন।

আশ্রমে সীতার কাছে দূত আসে রামচন্দ্রের আহ্বানে সীতাকে যেতে হবে স্নান সেরে শুদ্ধ বসনে। একথা শুনে সীতার মনে হতে থাকে যেন লঙ্কাবিজয়ের পরবর্তী ঘটনাবলী যেন পুনরাবৃত্ত হচ্ছে। তার চোখ জ্বালা করে অপমানে ভালোবাসায়। দ্বাদশ বছর পর স্বামী সাক্ষাতের জন্য বাল্মীকির পিছনে সাধারণ বস্ত্রে আবৃত হয়ে জানকী এসে রামচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হন। তিনি ভেবেছিলেন প্রয়োজনের তাগিদেও হলেও হয়তো রামচন্দ্র তাঁর ভুল বুঝেছেন। কিন্তু তাঁর সেই ভাবনা ভুল প্রমাণিত হয়। মলিনবেশ পরিহিতা সীতাকে দেখে অন্য রাজাদের নিকট রামচন্দ্রের মর্যাদা লুণ্ঠিত হয় বলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। কঠিন স্বরে জানান যে সীতার প্রতি কোনরকম আসক্তির কারণে তিনি স্ত্রীগ্রহণ করেননি অপযশ মোচনের জন্য তিনি সীতাকে আহ্বান করছেন। সীতা যেন আত্ম শুদ্ধির মধ্য দিয়ে তার কলঙ্ক মোচন করেন। সীতা প্রতিবাদ করে শির উন্নত করে বলেন– পৃথিবীব্যাপী যে নৃপতির ন্যায় বোধের প্রচার, তাঁর কাছে এক নারী যদি এই অভিযোগের বিচার চায় রাম কি সেই বিচারকের আসনের যোগ্য হবেন? সীতা ধিক্কার জানান রামরাজ্যে। সীতা আবার বলেন–

> "পাপ কাকে বলে মহারাজ? শরীরে কোন পাপ হয় না। পাপবোধ একটি মানসিক অনুভূতি। আমার মনে সেই বোধ নেই। বিবশ অবস্থায় রাবণ যদি আমাকে স্পর্শ কোরেও থাকে– সে পাপ আমার নয়।"[৬]

আর কোন আত্মসম্মান হানিকর প্রস্তাবে রাজী হননি সীতা। প্রশ্ন রেখেছেন সবার সামনে- পুরুষদের জন্য যদি সতীত্ব প্রয়োজন না হয়, নারীর জন্য বা কেন তা প্রযোজ্য হবে। সীতা আর কোন কিছুতেই সম্মত নন। তাই মা বসুন্ধরার কাছে বলেন—

> "পৃথিবী বিদীর্ণ হোক, সেই পুণ্যবলে/যদি আমি রাম ছাড়া কাউকে না জানি।"[৭]

এরপরই পৃথিবী কাঁপিয়ে ঘর্ঘর শব্দ ওঠে। এক দিব্য সিংহাসন জানকীর পাশে এসে দাঁড়ায়। পরিস্থিতি টের পেয়ে রামচন্দ্র বলেন– সীতাকে গ্রহণ করতে চায়।কিন্তু সীতা আর ধরা দেননা।বায়ু বেগে রথ উড়ে যায়। যে পৃথিবী রামচন্দ্রের সম্পত্তি, যে সমাজে নারীর মর্যাদা বার বার ভূলুণ্ঠিত হয়, সে সমাজ ত্যাগ করে সীতা চলে যান।

এই ভাবে রামায়ণের চেনা পরিচিত সীতা এখানে প্রতিবাদী সত্ত্বায় স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছেন। এই উপন্যাস যেমন পুরুষতন্ত্রের প্রতি এক নারীর তীব্র প্রতিবাদ ঘোষিত হয়েছে। তেমন প্রান্তিক শ্রেণির উপর অত্যাচারের প্রতিবাদও করেছে এবং নিরস্ত্রীকরণের বার্তাও দিয়েছে। সব মিলিয়ে রামায়ণের চিরপরিচিত সীতাকে নিজের ভাবনায় এক আধুনিক নারীরূপে গড়ে তুলেছেন, যা লেখিকার অনন্য সৃষ্টি হিসাবে বাংলা সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছে। সীতায়ন উপন্যাসটির মত মল্লিকা সীতাকে নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছেন। 'রাষ্ট্রপতিকে লেখা একটি মেয়ের চিঠি, এই কবিতায় লেখিকা সীতাকে নিরস্ত্রীকরণের বার্তা বাহক হিসাবে ব্যবহার করেছেন। হাজার হাজার বছর আগে সেই রামায়ণের যুগে একজন নারী নিজের স্বামীকে অস্ত্র ত্যাগ করার কথা বলেছিল। এই নারী সীতা। এই কবিতায় সীতা বলেছেন –

> "যে মাটিতে এত আণবিক ছাই
> সে মাটির মেয়ে সীতা
> অস্ত্র থামাতে বলছি রামকে
> আমি হলকর্ষিতা।"[৮]

'অস্ত্রপুরুষ' কবিতাটিতেও রামায়ণের প্রসঙ্গ তুলে একইভাবে নিরস্ত্রীকরণের বার্তা দিয়েছেন কবি। এখানেও সীতার কথা রয়েছে। যুদ্ধে যেমন রাষ্ট্রের ক্ষতি হয় তেমন যেকোনো যুদ্ধে মেয়েরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনার্য বিদ্বেষের কারণে একসময় সীতাকে যেমন বনবাসী হতে হয়েছিল সেরকমই বর্তমানকালের যুদ্ধে গৃহবধূ অন্নাভাবে কষ্ট পায়, নারীরা ধর্ষিত হয়। তাই এই কবিতাটিতেও দেখা যায় সীতা রামচন্দ্রের বাহু ধরে বার বার আর্তস্বরে অস্ত্র ফিরিয়ে নেওয়ার কথা বলছেন। কিন্তু তাঁর আবেদন বিফল হয়েছে। কবি বলছেন –

> "সীতা জানতেন, রাম কত নিরপরাধের মৃত্যুর কারণ
> ক্ষত্রিয়ের কাছাকাছি তীর ও ধনুক
> ক্ষমতার কাছাকাছি বোমারু বিজ্ঞানী
> এবং অগ্নির কাছে ইন্ধন এলেই হিংসা- সীতা জানতেন।।"[৯]

সেই যুগের অস্ত্রপুরুষ আজও দেশে দেশে দৌড়ে চলেছেন।

কবি 'ধনতেরস' কবিতাটিতে সীতার মায়ামৃগ দর্শনের প্রসঙ্গ এসেছে। 'Grafftti' পত্রিকার একটি উক্তি মল্লিকা এই কবিতার প্রথমে তুলে ধরেছেন। সেখানে বলা হয়েছে- 'Jwellary is a womans greatest weakness and a mans biggest expense'. এই উক্তিতে মল্লিকার ঘোর আপত্তি রয়েছে। ধনতেরস একটি শুভ তিথি। এই দিনে সোনার বাজারে মানুষের ভিড় জমে। কারন সোনা কেনা এই দিনে শুভ বলে মনে করা হয়।আবার কবি মনে করেছেন এই সোনা উদ্বেল পৌরুষের প্রতীক। কারণ পুরুষ তার অর্থবলে স্ত্রীকে সোনা কিনে দেয়।আর স্বামী সোহাগিনী নারী বুঝতে পারেনা যে সে 'সোনার খাঁচার ময়না'।তাই সীতার প্রসঙ্গ তুলে মল্লিকা এখানে বলেছেন–

> "যে মেয়ে সোনার হরিণ ধরতে
> উন্মাদ হয়েছিল
> সেই একদিন সোনার গয়না
> পথে পথে ফেলে দিল।"[১০]

সীতা হরণের প্রসঙ্গ টেনে এখানে মল্লিকা বলেছেন একদিন এই স্বামী সোহাগিনী নারীদের মতই সোনার হরিণ ধরতে চেয়েছিল। আবার এই সীতাই স্বামীকে ফিরে পাবার জন্য নিজের সোনার গয়না পথে ফেলে দিয়েছিল। পুরুষের প্রকৃত ভালবাসা নারীর কাছে অর্থের চেয়েও দামি এ কথায় ব্যক্ত করেছেন লেখিকা।

সীতাকে নিয়ে লেখা মল্লিকার একটি সংলাপ কবিতা হল 'অশোকবনের সীতা সরখেল'। কবিতাটিতে মল্লিকা আধুনিক প্রেক্ষাপটে রামায়ণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি করেছেন। এখানে বিডিও ম্যাডাম সীতা সরখেল সীতার প্রতীক এবং বনমিলিসিয়া রাবণের প্রতীক। রামায়ণের সীতার মতই এখানেও বিডিও সীতা সরখেলকে বনমিলিশিয়া কিডন্যাপ করে। কয়েকদিন বন্দী থাকার পর বিডিও মুক্তি পায়। কিন্তু বাড়ি ফিরে এযুগেও তাকে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। শাশুড়ী স্বামী এবং সংবাদমাধ্যমও তার সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে। এযুগের সীতাও তার স্বামীর কাছে জবাবদিহি করতে চাইনি। তাই রামায়ণের সীতার মতো স্বামীকে ত্যাগ করে প্রকৃতির বুকে ফিরে যায়। যুগে যুগে এভাবেই সীতাদের পুরুষতন্ত্রের কাছে নিজের মান সম্মান বিসর্জন দিতে হয় তা কবি বার বার তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন।মল্লিকার আরেকটি রামায়ণমূলক কবিতা 'উল্টো রামায়ণ'। কবিতাটিতে দুটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশে আমরা দেখি কবি বলছেন-

> "রাবণ জয়ের পর শভিনিস্ট রাম বললেন
> এবার সাবান মেখে গঙ্গাজলে স্নান করো সীতা
> রাক্ষসের ঘাম যদি লেগে থাকে তোমার শরীরে
> চন্দ্রাহত আমাদের হনিমুন হবে রামতিতা।
>
> সীতা কিন্তু বললেন আগেই স্নানের কথা কেন?
> আগে তুমি দেখা দাও ,আলিঙ্গন দাও হ্যান্ডসাম
> তা হবে না, স্নান করে পট্টবস্ত্রে দিব্য অলংকারে
> সাজিয়ে গুছিয়ে তাকে নিয়ে এসো, বললেন রাম।"[১১]

লঙ্কা জয় করে বিজয়ী রাম সীতার অগ্নিপরীক্ষা নিয়েছিলেন। এ অনেকদিন পর প্রিয়তমা পত্নীকে ফিরে পেয়ে আলিঙ্গন না করে যে পরীক্ষা নিয়েছিলেন তা সীতার প্রতি ছিল চরম অপমানজনক। কারণ সমগ্র অযোধ্যাবাসীর সামনে এই অপমানজনক ঘটনা ঘটেছিল। রামায়ণে সীতা অগ্নিপরীক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু এখানে সীতা এই অপমানের জবাব চেয়েছেন। কবিতাটির পরের অংশে মল্লিকা বলেছেন যদি একুশ শতকে ঘটনাটি উল্টো হয়, অর্থাৎ এ যুগের রামকে যদি কোনও সুন্দরী রাক্ষসী অপহরণ করে নিয়ে যেত তাহলে কি একই ভাবে অগ্নিপরীক্ষা দেবেন এযুগের রাম? ক্ষমা চাইবেন রাজ্যবাসীর কাছে? এ প্রশ্ন রেখেছেন কবি মল্লিকা।

রামায়ণের সীতার মতো মহাভারতের দ্রৌপদীর প্রসঙ্গ মল্লিকার কবিতায় বহুবার এসেছে। মহাভারতের অসামান্য নারী পঞ্চপাণ্ডব-পত্নী দ্রৌপদী ভারতীয় নারীদের মধ্যে ব্যতিক্রমী চরিত্র। রাজা দ্রুপদের যজ্ঞস্থল থেকে তাঁর জন্ম। দ্রৌপদীর পিতা তাঁর জন্য অভিনব স্বয়ম্বরের আয়োজন করেছিলেন। মাছের প্রতিবিম্ব দেখে যে রাজা সেই মাছের চোখ বিদ্ধ করতে পারবেন সেই দ্রৌপদীর স্বামী হতে পারবেন এই ছিল শর্ত। ব্রাহ্মণবেশী অর্জুন এই লক্ষ্যভেদ করতে সমর্থ হন। দ্রৌপদীও অর্জুনকে দেখে মুগ্ধ হয়ে মনে মনে তাকে পতিরূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু অর্জুন তাঁর মনের কথা বুঝতে পারেননি। তাই মাতৃ আজ্ঞা পালন করে পাঁচ ভাই মিলে দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করেন। পঞ্চস্বামীর স্ত্রী হয়েও দ্রৌপদীর জীবনে জোটে যন্ত্রণা। মল্লিকা এই দ্রৌপদীকে নিয়ে লিখেছেন 'দ্রৌপদীর স্বামীরা' 'দ্রৌপদীর গান', 'দ্রৌপদী' 'দ্রৌপদীজন্ম' প্রভৃতি কবিতা। 'দ্রৌপদীর স্বামীরা' কবিতায় দ্রৌপদী তিন স্বামীর প্রতি তাঁর অভিযোগগুলি তুলে ধরেছেন। অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী বলেছেন—

"তৃতীয় পার্থ তোমার জন্য
কলঙ্ক জলে ডুব দিলাম
পাঁচ ভাতারির বদনাম নিয়ে
রাজসভা ঘরে রূপ নিলাম।"[১২]

অর্জুনকে দ্রৌপদী এককভাবে নিজের করে পাননি।অনিচ্ছা স্বত্বেও তাঁকে যেমন অন্য পতিদের কাছে নিজের যৌবন সমর্পণ করতে হয়েছে তেমন অর্জুনও তাঁকে ফেলে অন্য নারীদের প্রতি আসক্ত হয়েছেন, বিবাহ করেছেন। তাই অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর প্রশ্ন—

"তোমাকে কে বেশি ভালবেসেছিল
আমি নাকি মনিপুরিকা?"[১৩]

দ্রৌপদী অর্জুনের সঙ্গীদের বরণ করতে করতে ক্লান্ত। তাই তিনি মৃত্যুবরণ করে একান্তভাবে অর্জুনকে পেতে চেয়েছেন। পরক্ষণেই আশঙ্কা করেছেন এপারের মতন ওপারে অর্জুন মেতে যেতে পারেন 'নতুন আলতা খোঁপাতে'।

আবার 'দ্রৌপদী' কবিতাটিতে কবি দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ প্রসঙ্গটি তুলে ধরে সাম্প্রতিককালের নারী নিগ্রহর প্রতিবাদ করেছেন। স্বয়মবর সভায় দ্রৌপদী অর্জুনকে পতি হিসাবে নির্বাচন করেছিলেন বলে প্রতিশোধস্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে দুঃশাসন তাঁর বস্ত্র হরণ করে তার পৌরষ প্রমাণ করে। তবে পাণ্ডবরাও এজন্য সমানভাবে দায়ী। কারণ পাশা খেলায় স্ত্রীকে পণ রাখেন পঞ্চপাণ্ডবেরা। তাই মল্লিকার দ্রৌপদী প্রশ্ন করেছেন—

"আমি একা হাটের মাঝে, হাটখোলা কাপড় খোলা
দোষ শুধু কৌরবেরই দোষী নয় পাণ্ডবেরা?
যে আমাকে পণ্য করে স্বঘোষিত প্রভু আমার
তাকে আজ প্রশ্ন করি মানুষের মূল্য কত!"[১৪]

মল্লিকা সেনগুপ্তর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'কথামানবী'।এই কাব্যে মল্লিকা প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকালের আট জন নারী তাঁদের উপর ঘটে যাওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন। 'দ্রৌপদীজন্ম' এই কাব্যের দ্রৌপদীকে নিয়ে লেখা অন্যতম কবিতা। এই কবিতাটিও শুরু হয়েছে বস্ত্রহরণের ঘটনা দিয়ে। হস্তিনাপুরের গৃহবধূকে যখন পাশা খেলায় পণ রেখেছিলেন তাঁর স্বামী তখন সভাঘর স্তব্ধ হয়েছিল। রজঃস্বলা একবস্ত্রা দ্রৌপদীর যখন সবার সামনে নিগৃহীত হলেন তাঁর কোনও স্বামী প্রতিবাদ করেননি।তাই দ্রৌপদী বলেছেন—

"তোমরা পুরুষজন,বাঁ হাতে নারীকে ঠেলে অন্দরে পাঠাও

ডান হাতে তোমরাই গা থেকে কাপড় খুলে নাও উন্মুক্ত বাজারে।”[১৫]

পুরুষই বিধান দেয় আবার পুরুষই বোবা হয়ে থাকে। জগতে পুরুষে পুরুষে লড়াই হয় আর নারীরা নিগৃহীত হয়। দ্রৌপদীকে সেদিন রক্ষা করেছিলেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণ সেদিন আশ্বস্ত করেছিলেন তাঁকে।

মল্লিকার 'দ্রৌপদীর গান' প্রতিবাদী নারী দ্রৌপদীর জয়গান। দ্রৌপদী বলেছেন—

“আমি জ্বলতে এসেছি
জ্বালাতে এসেছি
নারীর আগুনবহ্নি
প্রতিবাদ করে
বাঁচতে শিখেছি
আমি অপরূপ তন্বী।”[১৫]

মল্লিকা সেনগুপ্ত ছিলেন সমাজ সচেতন কবি। তাই সমাজে নারীর অবমাননা সবসময় তাঁকে ব্যথিত করেছে। পুরাণ ইতিহাস রাজনীতির আলোকে তিনি তাঁর ভাবনা ব্যক্ত করে, সমাজে নারীর হৃত মর্যাদা পুনুরদ্ধার করে তাঁকে তার যোগ্য আসনে অধিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তিনি। তাই মহাকাব্যের দুই নারী সীতা ও দ্রৌপদীকে নিজ ভাবনায় নবরূপে নির্মাণ করেছেন।

তথ্যসূত্র :

১. সরকার সুবোধ (সম্পাদক) মল্লিকা সে্নগুপ্ত, পদ্যসমগ্র, প্রথম সংস্করণ, মার্চ ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স কলকাতা পৃ. ২০৬
২. সরকার সুবোধ (সম্পাদক) মল্লিকা সে্নগুপ্ত, গদ্যসমগ্র, প্রথম সংস্করণ, মার্চ ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স কলকাতা পৃ. ৯
৩. তদেব পৃ. ১২
৪. তদেব পৃ. ১৫
৫. তদেব পৃ. ২০
৬. তদেব পৃ. ১১৮
৭. তদেব পৃ. ১১৮
৮. সরকার সুবোধ (সম্পাদক) মল্লিকা সে্নগুপ্ত, পদ্যসমগ্র, প্রথম সংস্করণ, মার্চ ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স কলকাতা পৃ.
৯. তদেব, পৃ. ১৯৫
১০. তদেব, পৃ. ৩৪৬
১১. তদেব, পৃ. ৫৫৭
১২. তদেব, পৃ. ২০৮
১৩. তদেব, পৃ. ২৮৯
১৪. তদেব, পৃ. ৩১৬
১৫. তদেব, পৃ. ৩১৭